কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় ডিজাইনের নানাবিধ অনুষঙ্গ

আব্দুস সাত্তার*

সারসংক্ষেপ : *বাংলাদেশের চিত্রকলা জগতের অন্যতম প্রধান শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-২০১৪)। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হকের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ)-এর দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্র ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। তাঁর চিত্রকলার ভুবন বৈচিত্র্যময়তায় পরিপূর্ণ। ব্যবহারিক শিল্পকলার নানাবিধ দিক যেমন– প্রকাশনা, গ্রন্থ এবং পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন ও বিশেষ করে টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে তাঁর যে বিপ্লবাত্মক ভূমিকা তা থেকেই মানুষ কাইয়ুম চৌধুরীকে চেনেন। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহারিক শিল্পের নানা শাখায় বিচরণ, ডিজাইন সেন্টারে নকশাবিদ হিসেবে যোগদান ও গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে শিক্ষকতা, এর সবকিছুর প্রভাবেই অগ্রসর হয়েছে কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলার চর্চা। তাঁর ক্যানভাসে জাগ্রত হয় মানুষ, প্রকৃতি, পশু-পাখি, নৌকা, মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজবাস্তবতা এক বিশেষ শৈলীতে। কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় নানারকম মোটিফ বা নকশার ব্যবহার ও ডিজাইনিক সেন্স এক ভিন্ন মাত্রা দান করে। তাঁর চিত্রকলার স্বরূপ উন্মোচনে ডিজাইনের নানাবিধ অনুষঙ্গের রূপায়ণ ও লোকশিল্পের আঙ্গিক প্রয়োগের তুলনামূলক আলোচনাই এই প্রবন্ধের মূল কথা।*

শিল্পকলার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চেতনার সম্পর্ককে একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট একজন শিল্পীর সচেতন উপলব্ধি ও একাত্মতা হিসেবে বর্ণনা করা যায়।[১] সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে জাতিসত্তার পরিচয়কে বিধৃত করার এই

*সহযোগী অধ্যাপক, অঙ্কন ও চিত্রায়ণ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আকাঙ্ক্ষা জাতীয় কৃষ্টির নির্যাস ও মৌল রূপকে সন্ধান করারই আকাঙ্ক্ষা।[২] আর এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর চিত্রকর্ম নির্মাণ করেছেন।

বাংলাদেশের শিল্পকলার পথ নির্মাণে যেসব শিল্পী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, কাইয়ুম চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশের চিত্রশিল্পের সমৃদ্ধির পেছনে তাঁর বিপুল ভূমিকা তাই বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। তাঁর চিত্রকর্মের স্বতন্ত্র ডিজাইন, মোটিফ বা নকশা যাই বলি না কেন, তা চিত্রপটে নিজস্বতা ও আকর্ষণীয় মাত্রা দান করে। কাইয়ুম চৌধুরী সবসময়েই তাঁর শিল্পকর্মে সন্ধান করেছেন নিজস্ব শিল্পীসত্তা, জাতির ঐতিহ্য ও জাতিসত্তার নিবিড় অধ্যয়ন। অনুশীলন ও চর্চার মধ্য দিয়েই যে নিজস্ব ও দেশজ শিল্পীসত্তা গড়ে তোলা যায় সেটা নিয়ে কাইয়ুম চৌধুরীর মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না।[৩]

১৯৫৪ সালে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কাইয়ুম চৌধুরী ফাইন আর্টস বিভাগের পাঠ সমাপ্তি করেন। নবগঠিত আর্ট কলেজে যেসব ছাত্র ভর্তি হয়েছিলেন তাঁদের কারোরই পরবর্তীকালে পেশা কী হবে, সে সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তাঁদের একমাত্র অভিলাষ ছিল শিল্পী হয়ে ওঠা। ছাত্রজীবনেই কাইয়ুম চৌধুরী বইয়ের প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন কাজে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে কাইয়ুম চৌধুরী নানা ধরনের ব্যবহারিক কাজ ও বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, করেছেন বইয়ের প্রচ্ছদ ও সচিত্রকরণের কাজ। তখন পূর্ববঙ্গে প্রকাশনার সূচনাকাল মাত্র। পাঠ্যবইয়ের বাইরে সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনা খুব কমই হতো। তখন মুদ্রণ পদ্ধতি ও রঙিন প্রচ্ছদ ছাপার রীতিও ছিল সেকেলে ধাঁচের। ধীরে ধীরে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জাগরণ বাংলা সাহিত্য ও প্রকাশনায় আশার আলো তৈরি করেছিল। কিছুকাল ছায়াছবি নামে একটি চলচ্চিত্র সাময়িকী যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত জহুরুল হকের সাত-সাঁতার গ্রন্থের প্রচ্ছদে একটি পালাবদল ঘটালেন। সচিত্র সন্ধানী পত্রিকাতে তাঁর অঙ্কন, টাইপোগ্রাফিবোধ ও ডিজাইনে প্রতিফলিত হচ্ছিল আস্থার ভাব ও নতুনত্ব।[৪] পেশাগত জীবনে অঙ্কন শিল্পী হিসেবে ইংরেজি দৈনিক অবজারভার-এ চাকরিরত অবস্থায় কবি জসীমউদদীনের জীবন কথা (১৯৬৪) বইয়ের প্রচ্ছদ করেন এবং একই বছরে এই বইয়ের জন্য জাতীয়

গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদ শিল্পীর পুরস্কার লাভ করেন। এই বইতে কাইয়ুম চৌধুরী বাংলার লোকসংস্কৃতির জামদানি শাড়ির ডিজাইন ব্যবহার করে প্রচ্ছদ শিল্পে এক নতুন বার্তা দিলেন। বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের সূত্রে এদেশের বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিকদের সাথে তাঁর এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এদের মধ্যে কবি জসীমউদদীন, শওকত ওসমান, ফররুখ আহমেদ, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৫] ১৯৯৮ সাল থেকে আমৃত্যু কাইয়ুম চৌধুরী দৈনিক প্রথম আলোর শিল্প উপদেষ্টা ছিলেন। দেশের প্রকাশনাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় তুলে ধরার জন্য তাঁর অবদান অসামান্য।

চিত্র-১ : বইয়ের প্রচ্ছদ, পোস্টার ও গানের সিডি কভার ডিজাইন

ব্যবহারিক শিল্পের নানাবিধ কর্মে বিচরণ করলেও কাইয়ুম চৌধুরী কিন্তু হাঁটছিলেন ছবি আঁকার পথে। তিনি যতই শিল্পের গভীরে নিমগ্ন হচ্ছিলেন, ততই তাঁর নিজস্ব শৈলীর বিচ্ছুরণ ঘটে। কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় ব্যবহারিক শিল্পের নানাদিক তাঁর নিজস্ব স্টাইল বা বৈশিষ্ট্য তৈরিতে সহায়ক হয়েছিল। কাইয়ুম চৌধুরীর ছবিতে মানুষ নিসর্গ বেষ্টিত। কখনো তিনি দৃষ্টিনন্দন বৃক্ষলতার মোটিফের স্নিগ্ধ পরিমার্জনায় শিল্পের নান্দনিক সিদ্ধি অনুসন্ধান করেন। তাঁর কাজে সুবিন্যস্ত মোটিফগুলো শূন্য স্পেসে দ্বিমাত্রিক ডিজাইনের শর্ত স্পষ্ট করে তোলে।[৬] তাঁর কাজের বিষয়সমূহ গাছপালা, পশু-পাখি, নদী, নৌকা, ঘর-গৃহস্থালি, মানুষের শরীরের বিপরীতে ইলাস্ট্রেশন। তাঁর চিত্রে চারপাশের চাপের অভিজ্ঞতা শরীর বহন করে। তিনি চেনা বিষয়ের মধ্যে শরীরকে প্রকাশভঙ্গিম করে তোলেন। তাঁর ক্যানভাসে ফিগার শুদ্ধ রঙে উচ্চকিত, কিন্তু চারপাশের বিষয় নয়।[৭]

কাইয়ুম চৌধুরী তাঁর চিত্রকলায় স্পেসের বিভাজনে যে ডিজাইন বা নকশার সমন্বয়ে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করেন তা আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক। প্রতিটি বস্তুর সরলীকরণে একধরনের কাঠামোগত আভাস ও ডিজাইনিক।

চিত্র-২ : প্রতিবাদ ও পালতোলা

আদলে দ্বিমাত্রিক রঙের সন্নিবেশ ঘটান। আবার একই সাথে তাঁর চিত্রকলায় সমতল রঙের উপর অন্য রঙের বিরোধাভাস ঘটান।

যে কোনো চিত্রকর্মে রেখাঙ্কন অথবা বর্ণবিভা, আলো এবং অন্ধকার একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। শিল্পীও তাঁর শিল্পের অভিব্যক্তিকে কোনো একটি ক্রমধারার বোধ্যগম্যতার মধ্যে আনেন না। শিল্পকর্মে প্রকাশময়তার পরিতৃপ্তির জন্য কোনও শিল্পীর কাছে একটিমাত্র উপকরণই সামগ্রীক বোধের উৎসাহ হতে পারে, তখন অন্য উপকরণগুলো আনুষঙ্গিকরূপে বিদ্যমান থাকবে।[৮] তদ্রূপ কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকলায় বিষয়বস্তুর সাথে অন্য উপকরণগুলো আনুষঙ্গিক হিসেবে ডিজাইন মোটিফে উপস্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে তাঁর 'জীবন তৃষ্ণা' পেইন্টিংএ সেল্ফ পোর্ট্রেটের সাথে গাছপালা, পাখি, মাছ, নদী ও নৌকাকে ডিজাইনিক ফর্মে বিন্যস্ত করেছেন। কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্র হচ্ছে ঐকতানের মতো যেখানে রংই প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং রঙের সাহায্যেই ডিজাইনিক ফর্ম উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমরা ফবিষ্ট শিল্পী মাতিসের অনেক চিত্রকর্মেই রংকে সকল উপকরণের সর্বস্ব হিসেবে দেখি। শিল্পী হেনরি মাতিসের The sorrows of the king, 1952, gouache on canvas চিত্রকলায় দ্বিমাত্রিক ফর্মের যে ডিজাইন ও উচ্চকিত রঙের ব্যবহার দেখতে

পাই, তা কাইয়ুম চৌধুরীর অনেক চিত্রকর্মের সাথে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া মাতিসের ১৯০৮ সালে করা Red Room চিত্রকর্মে সমতল রঙের উপর যে ডিজাইনিক ফিগার, জানালা ও বস্তুগত উপাদানকে এক সুতোয় গেঁথেছেন, তেমনি কাইয়ুম চৌধুরীও তাঁর চিত্রকলার সাবজেক্টকে নানারকম মোটিফ, আল্পনা ও দেশীয় লোকজ উপাদানের সমন্বয়ে বিন্যাস করেন। লোককলাকে আশ্রয় করে যাঁদের ঐতিহ্যিক চেতনা আবর্তিত ও নির্মিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে কাইয়ুম চৌধুরী অন্যতম। তবে এক্ষেত্রে তাঁর সমসাময়িক রশিদ চৌধুরী থেকে তাঁর ভিন্নতা দৃশ্যমান। রশিদ চৌধুরী ঐতিহ্যের সন্ধান করেন লোকজীবনের উপচার, মূর্তিকলা, গল্পগাথা ও শৈশবস্মৃতির রূপায়ণ করেন প্রতীকী উপস্থাপনায়। অন্যদিকে কাইয়ুম চৌধুরীর কাছে লোককলার বিষয়বস্তু মূল্যবান নয়। তিনি বিষয় থেকে বিযুক্ত করে নেন এর মোটিফ ও নকশা এবং তাকে প্রয়োগ করেন তাঁর নিজস্ব প্রেক্ষাপটে। লোকশিল্পের কারুকাজ যেখানে প্রোজ্জ্বলভাবে উপস্থিত–হাতপাখা, নকশিকাঁথা, আল্পনা, মাটি ও কাঠের পুতুল, বাঁশ-বেতের কারুকাজ, নৌকার গলুই কিংবা পিঠার ছাঁচ, শাড়ির পাড়, শখের হাঁড়ি–এ সবই তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে, লোকশিল্পের ডিজাইনের জ্যামিতিকতাকে তিনি দ্বিমাত্রিক চিত্রতলে সংহত করেন এবং লৌকিক ফর্ম ও নকশাকে একটি নির্বস্তুক সংগঠনের মাত্রায় ব্যবহার করেন। নিসর্গই তাঁর বিষয়ের মৌলরূপ। বাংলার নিসর্গ থেকে তিনি উপাদান চয়ন করেন। গাছ, পাতা, সূর্য, পাখি, নৌকা, মাছ, সাঁকো ইত্যাদি চিরায়ত গ্রামীণ নৈসর্গিক উপাদানকে তিনি নিজস্ব জ্যামিতিক বিন্যাসে গড়ে নেন এবং লোকশিল্পের মোটিফ ও নকশায় জড়িয়ে গড়ে তোলেন নিজস্ব কারুকাজ। তাঁর প্রথম দিকের বর্ণবিন্যাস নমিত ও পেলব, দৃষ্টিতে এনে দেয় স্নিগ্ধতা ও গীতলতা। নৌকা ও জলের পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁর প্রিয় বিষয়, নৌকার গলুই-এ অঙ্কিত চোখ তাঁর প্রিয় প্রতীক।[৯] তাঁর ১৯৬৩তে "পালতোলা নৌকা" ও ১৯৬৭তে "নৌকা" ছবিতে নানারকম আল্পনার সমন্বয়ে যেভাবে নৌকা গলুই ও তার পালকে চিত্রিত করেছেন তা তাঁর নিজস্বতাকে বহুগুনে প্রসারিত করেছে। তিনি স্পেসে রং, ফর্ম ও ডিজাইনকে সমন্বিত করে এক ধরনের ঐকতান সৃষ্টি করেছেন। ১৯৫৬ সালে আঁকা কাইয়ুম চৌধুরীর চন্দ্রালোকে নৌকা ছবিতে স্পেস থেকে ডিজাইনিক কাঠামোতে নৌকা, চাঁদ, মাছ, পাতা, পানিতে চাঁদ ও নৌকার প্রতিবিম্ব ও ভাসমান পাতাকে সংগঠিত করে যে আবহ তৈরি করেছেন

তা তাঁর চিত্রকলাকে ডিজাইনিক বিন্যাসের পরিপূর্ণতা দান করে। ২০১৪ সালের ১২ই মে শিল্পকলা বিষয়ক ম্যাগাজিন 'শিল্পপ্রভা'র পক্ষ থেকে মাহাবুব রেজা শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি বলেন, মানুষের জীবনের অন্য আরেক নাম রং। পৃথিবীতে যত রং আছে আমি মনে করি তার চেয়েও বেশি রং আমাদের লোকশিল্পে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমাদের লোকশিল্প পৃথিবীর যে কোনো লোকশিল্পের চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। বাংলার লোকশিল্প আমাকে শিল্পী করেছে। তাঁদের রং ব্যবহারের দিকটি ও ফর্মকে আমি অনুধাবন করি। তাদের কাজের মধ্যে সিমপ্লিফিকেশন-এর বহুমাত্রিক ব্যবহার আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে।[১০]

চিত্র-৩ : ৭ই মার্চ'৭১ ও দুপুরের নদী

নকশা বা ডিজাইন কী করে পেইন্টিং হয়ে উঠে, এর অনন্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই তাঁর নকশা চিত্রকর্মটিতে। এই ছবিতে বর্ণের পরতে নকশার উপস্থাপনায় বৃক্ষ, পাতা ও পাখিকে বিমূর্ততার চিত্রভাষা সৃষ্টি করেছেন তা স্মরণীয়। এ ধরনের আরেকটি চিত্রকর্ম কাইয়ুম চৌধুরীর ১৯৬৭ সালে অঙ্কিত গোধূলি-২ এবং ১৯৭২ সালে ৭ই মার্চ ৭১, ও শহীদ ৭১, ১৯৭৪ সালে শেষ গ্রীষ্মের লাল ছবিতে অত্যন্ত কৌশলে ও সুনিপুণভাবে তিনি বিষয়বস্তুকে ডিজাইনের নানাবিধ অনুষঙ্গে কোথাও ভারী বর্ণলেপনে প্রতীকী রূপে উপস্থাপন করেছেন, যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও নিজস্বতার দাবি রাখে। এ প্রসঙ্গে আমরা জার্মান শিল্পী পল ক্লি'র কিছু চিত্রকর্মকে তাঁর সাথে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। পল ক্লি তার চিত্রকর্মে কালার ও

ফর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু কাইয়ুম চৌধুরী কালার ও ফর্মের সাথে দেশজ উপাদানের সমন্বয়ে নকশাকে প্রধান্য দিয়েছেন।

সৈয়দ আলী আহসান তার শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য গ্রন্থে লিখেছেন–পল ক্লির চিত্রকর্মকে সুর সঙ্গতি হিসেবে বিবেচনা করা চলে অথবা সংগীতের তরঙ্গায়িত উচ্ছলতার সঙ্গে–মনে হয় তিনি যেন সংগীতের সুর সাম্যকে রেখাঙ্কনের মাধ্যমে পরিদৃশ্যমান করেছেন। কখনো এগুলোকে শিশু কল্পনার অভিনিবেশ বলেও মনে হয়–মনে হয় একটি অত্যাশ্চর্য পবিত্রতার অত্যন্ত সহজ রূপকর্মে সর্বজনীন কোনো সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। ক্লীর চিত্রকর্মকে বলতে পারি কবিতার দৃশ্যলোক। পল ক্লি এক সময় লিখেছেন, "পাখিরা যেভাবে গান গায় আমি সেই স্বচ্ছলতার চিত্র আঁকি।" তাঁর চিত্রের পৃথিবীতে আমরা ফুল দেখি, মাছ দেখি, তরঙ্গ দেখি, গাছ দেখি, গৃহাঙ্গন দেখি এবং সর্বস্বের মধ্যে আবার দেখি মানুষকে। কখনো বিমূর্ততায়, কখনো দ্বিমাত্রিক স্বাক্ষরে তারা জীবন্ত সচলতার রশ্মিরেখার মতো।

কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্মে এক ধরনের সরলতা আছে। নকশা আছে, আছে দেশপ্রেম, লোকশিল্প ও ঐতিহ্যের শেকড়। আছে সুরেরও ঐক্য। তিনি ছিলেন সংগীত অন্তঃপ্রাণ। শচীন দেববর্মন ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরীর পিতৃবন্ধু। কাইয়ুম চৌধুরীর শৈশবকালেই তাঁর বাবা কিনেছিলেন স্যুটকেস আকৃতির এক গ্রামোফোন। রাতের বেলা সন্তানদের পড়াশোনা শেষে সেই গ্রামোফোনে গান শোনা ছিল পুরো পরিবারের এক নিয়মিত অভ্যাস। পারিবারিকভাবেই কাইয়ুম চৌধুরীর গানের সাথে সখ্যতা এবং তাঁর কাছে অনেক দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড সংগ্রহে ছিল। এসব রেকর্ডের গানই শুধু তাকে আকৃষ্ট করেনি। তিনি রেকর্ডের ওপরকার স্লিভ বা লেভেলের ডিজাইনেও আকৃষ্ট হয়েছিলেন কৈশোর থেকেই।[১১] কাইয়ুম চৌধুরীর ১৯৭৬ সালে তেল রঙে আঁকা শৈশব স্মৃতি-২, উষা, শৈশব স্মৃতি-৩ এবং ১৯৭৭ সালে কার্তিকের অপরাহ্ন, ১৯৭৮ সালে আমার গ্রাম-১, ১৯৭৯তে আমার গ্রাম-৩, ১৯৮১ সালে জলমগ্ন গ্রাম-১, জলমগ্ন গ্রাম-২, ১৯৮৩তে জলমগ্ন গ্রাম-৩, ১৯৮৭ সালে দুপুরের নদী, ১৯৯০তে জোয়ার উল্লেখযোগ্য। এ পর্বের সমস্ত ছবিতেই তিনি নানাভাবে ডিজাইন বা নকশার সমন্বয়ে চিত্রকর্মকে বিষয়বস্তু ও বর্ণ মাধুরীর আবহে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ছবির ডিজাইন দর্শককে আকর্ষণ করে, বর্ণবিভা বিমোহিত করে।

চিত্র-৪: শহীদ ৭১ ও গহনা নৌকা

তিনি সংগীতকে যেমন ভালোবেসে অন্তরে ধারণ করতেন, তেমনি তাঁর ছবিতেও তৈরি করতেন একধরনের সুরের মূর্ছনা, তাঁর ছবির কাঠামো বা ডিজাইন কাঠখোট্টা নয়, বরং রোমান্টিকতার আবেশে আবেগের স্তুতি তৈরি করে।

তাঁর ১৯৭২ সালে ক্যানভাসে তেল রঙে আঁকা 'প্রতিবাদ' ছবিতে মানুষের মুখের অভিব্যক্তি বিশেষ করে চোখ ও তাঁদের সাথে বিভিন্ন রকমের ফেস্টুন ও প্লাকার্ড এবং পাতা, গাছপালা, দূরে দিগন্ত ও আকাশকে খণ্ড খণ্ড ডিজাইনের আদলে চিত্রে যে রস সঞ্চার করেছেন, তা আলোচনার দাবিদার।

১৯৯১ পরবর্তী কাজে কাইয়ুম চৌধুরী ডিজাইনকে বর্ণ পর্দায় মিলেমিশে একাকার করেছেন। কোথায়ও হালকা নীলাভ ধূসর কালারের বিপরীতে মূল সাবজেক্টের কোনো কোনো অংশকে প্রাথমিক রং লাল, নীল, হলুদ বা সবুজে ভাসিয়েছেন। ১৯৯৯ সালে তেলরঙে আঁকা বেদেনী, মধ্যদুপুর ও ২০০০ সালে মুক্তিযোদ্ধা, ২০০১ সালে শরতের দুপুর, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ, পরিবার এবং ২০০২ সালে মাছ ধরা ও ২০০৩ সালে প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য। মফিদুল হক তাঁর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত কাইয়ুম চৌধুরী Art of Bangladesh Series-6 গ্রন্থে উল্লেখ করেন–ষাটের দশকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়ে কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পীসত্তা বিকশিত হচ্ছিল তার একটি মূল্যায়ন মেলে পাকিস্তান কোয়ার্টারলিতে এস. আমজাদ আলী রচিত দীর্ঘ প্রবন্ধে, ১৯৬৫ সালের শরৎ ও শীত যুগ্ম সংখ্যা সাময়িকীতে 'ঢাকা আর্টিস্টস্' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধে। কাইয়ুম চৌধুরীর কাজে শুরুতে যে জটিল

ডিজাইন ও আলো-আঁধারির রহস্যময় খেলা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এখন তার স্থলে দেখছেন নতুন উত্তরণ। তাঁর মতে, 'Now he uses simple squares and circle for his broad designs and fills them up with simple decorative patterns derived from Bengali folk art, as the fish bone pattern, or the ear of corn, rosettes, heart shapes, zigzags, hachuring, or simply a repetition of P.c.aralleled lines drawn vertically or horizontally or both. A human or bird or animal form is introduced into the composition as just another element of design, dawn in the rudimentary folk style.

১৯৬৬ সালে কাইয়ুম চৌধুরী পঞ্চম তেহরান বিয়েনালে 'রাজকীয় দরবার পুরস্কার' লাভ করেন। এই একই সময়ে মর্নিং নিউজ পত্রিকায় বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর দীর্ঘ নিবন্ধ লিখেন। লেখার শিরোনাম ছিল–A world of Line, Colour and Design. তিনি এই নিবন্ধে লিখেন : "Qayyum is just not translating folk pattern and design in his works. He is using folk tradition for solving some pictorial problems. In him one palette, colour harmonies that are not only lyrical but of rare beauty, drawing that is more precise and a more conscious approach to volume. His use of design is a way of organizing his feelings and he is not ashamed of expressing sweetness, grace and pettiness. Qayyum is intensely aware of abstract elements in his art and it is interesting to note his tentative formulation of this problem.

লোকমোটিফ ও ডিজাইনের সংস্থান দ্বারা কাইয়ুম চৌধুরী অঙ্কিত এসব ক্যানভাসে ফিগারেটিভ উপস্থিতি বিশেষ ছিল না। তিনি মানুষের জীবনসামগ্রী তুলে এনেছেন জীবনকে সাজিয়ে তোলার লোকায়ত শিল্পধারা থেকে, আর তাঁর এই শিল্পরূপায়ণে প্রায়শ অবলম্বন হয়েছে প্রকৃতি-গাছ, বৃক্ষ, লতাপাতা, সূর্য, পাখি ইত্যাদি। মাছ বা নৌকো যখন তাঁর ছবিতে এসেছে তখন নৌকোর ফর্ম বা মাছকে ফর্মের মধ্যে দিয়ে দেখার প্রচেষ্টাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। একদিকে জ্যামিতিকতা, অন্যদিকে লৌকিক পেলবতা, এই দুইয়ের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস ফুটে ওঠে তাঁর কাজে। এটিও

স্মরণ রাখা দরকার, আইয়ুবী স্বৈরশাসনের সেই দিনগুলোতে কঠোর নিগড়ে বাঁধা ছিল সমাজ, মুক্তচিন্তা ও অধিকার-সচেতন রাজনীতি ছিল অবদমিত এবং চিন্তার দমনমূলক পরিস্থিতিতে রূপক ও ইঙ্গিতধর্মিতার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা বক্তব্য প্রকাশের উপায় খুঁজছিলেন। যদিও নব্বই-পরবর্তী কাজে আমরা কাইয়ুম চৌধুরীর ক্যানভাসে ফিগারের উপস্থিতি দেখতে পাই। কমার্শিয়াল কাজের মধ্য দিয়ে ডিজাইন ও ফর্ম নিয়ে তাঁর বিবিধ ভাবনা ছিল এই সৃষ্টিশীল অনুসন্ধানেরই সম্প্রসারিত রূপ। একই ভাবনা তিনি দুই ধারাতে প্রবাহিত করেছেন। ফলে তাঁর ডিজাইন, পোস্টার, ইলাস্ট্রেশন, প্রচ্ছদ এসব কমার্শিয়াল কাজের ছাপ ক্যানভাসে খুঁজে পাওয়া যায়। আবার ক্যানভাসের শিল্পচিন্তা কমার্শিয়াল আর্টে প্রভাব ছড়িয়েছে।[১২]

কাইয়ুম চৌধুরী ব্যবহারিক শিল্পকলার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট হয়েছেন তাঁর শিক্ষক কামরুল হাসানের দ্বারা, লোকজীবন থেকে শিল্পের পাঠ নেয়া এই শিক্ষাটা নিয়েছেন তিনি জয়নুল আবেদিনের কাছ থেকে। তাঁর দুই গুরুর কাছ থেকে তিনি দুটো জিনিস পেয়েছেন। শুধু তাঁর ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রেই নয়, জলরং কিংবা তেলরঙের ছবিতে সর্বত্রই এক ধরনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সেইসব ছবিতে প্রচ্ছদের নকশাধর্মিতা যেমন–এসেছে তেমনি আবার লোকজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সেটাতে তাঁর রং, তাঁর ভঙ্গিগুলো নিয়ে তিনি তাঁর শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। জয়নুল আবেদিন তাকে শিক্ষা দিয়েছেন যখন তিনি পত্রিকার কাজ করেছেন, পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন করেছেন, অলংকরণ করেছেন। সেই অলংকরণের মধ্যে নৌকা চলে এসেছে, জয়নুল আবেদিন বলেছেন যে, এই নৌকাকে কীভাবে নকশা হিসেবে ব্যবহার করা যায়, শিল্পে পরিণত করা যায়। নৌকার গলুই, গলুইয়ের চোখ এটা কাইয়ুম চৌধুরী ভাবেননি কিন্তু জয়নুল আবেদিন যখন দেখিয়ে দিলেন বিষয়টা এরকম হতে পারে তখন কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্পের পাঠ অন্যধারায় প্রবাহিত হলো এবং তাঁর চিত্রকলা লোকজীবন ও লোকঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে একটা নতুন পথের নিশানা পেল।

উল্লেখ্য যে কাইয়ুম চৌধুরী চারুকলায় যেখানে পড়াশুনা করেছেন–সেখানে জয়নুল আবেদিনের সহায়তায় তিনি শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আরেক প্রিয় শিক্ষক কামরুল হাসানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়ে

চলে গিয়েছিলেন Design Centre বা নকশা কেন্দ্রে। কামরুল হাসানের সাথে মতের মিল না হওয়ার কারণে ডিজাইন সেন্টারে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেননি। তিনি আবার পত্রিকার জগতে চলে যান। পরবর্তীকালে তার গুরু জয়নুল আবেদিন আবার তাঁকে আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে ডেকে আনলেন।[১৩] তিনি গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। আর তার এই পথচলার মধ্য দিয়েই কাইয়ুম চৌধুরী চিত্রকর্মকে ডিজাইনের আদলে দাঁড় করিয়েছেন।

আধুনিকতার সমরূপ হিসেবে কিউবিজম তখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হচ্ছিল। জয়নুল আবেদিনের ঐতিহ্য সচেতনতা ও কামরুল হাসানের কিউবিজমের মিশ্রণ যা ছিল জয়নুল পরবর্তী আধুনিকতার চিত্রভাষা তৈরিতে সমসাময়িক শিল্পে অভিনব, আর এই দুই ভাষাকে একত্রিত করে গ্রহণ করলেন কাইয়ুম চৌধুরী। যে ব্যাপারটি কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রকর্মে নতুন ছিল তা হলো ভারতীয় শিল্পের আদর্শকে ছবির মধ্যে যুক্ত করা, ভারতীয় শিল্পের যে ডিজাইন কোয়ালিটি সে সম্পর্কে কাইয়ুম চৌধুরী বলেছেন–I think the composition of painting is itself a design. A major aspect of folk art is design. In the Indian tradition the construction of painting is primarily design based, line based.[১৪]

কাইয়ুম চৌধুরীর প্রতিটি ছবির রচনাই এক প্রকার ডিজাইন। এই নকশাধর্মিতা লোকজশিল্পেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বাস্তবতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজের কর্মধারা চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার হিসেবে তাঁর দুই সত্তাকে পরস্পরের পরিপূরক করে তুলেছে। ছবির জমিনে অবয়ব ভাঙার যেসব কলাকৌশল বা রঙের ওভারল্যাপিংয়ের আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেন তা একইভাবে প্রচ্ছদ ও অলংকরণেও অনুসরণ করেন। ফলে চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার হিসেবে তাঁর দুই সত্তাকে আর পৃথক করা যায় না।[১৫] স্পেসে নানা ফর্ম ও ডিজাইনের ব্যবহারে লোকরীতি, জ্যামিতিকতা ও উজ্জ্বল চড়া রং আবার কোথাও শীতল নীলের ব্যবহার তার ছবির কাঠামোগত ডিজাইনকে দর্শক আকর্ষণ করে। দৃশ্যমান অভিজ্ঞতা, আর স্মৃতির রূপকল্পে প্রকৃতি আর ঐতিহ্যের আবাহনে উৎসারিত হয় কাইয়ুম চৌধুরীর ছবির জগৎ।[১৬] আর এভাবেই কাইয়ুম চৌধুরী একের পর এক সৃষ্টি করেছেন তাঁর চিত্রকলার ভুবন। যে ভুবনে ডিজাইনের নানা রকম অনুষঙ্গ মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. আবুল মনসুর, শিল্পী দর্শক সমালোচক, মুক্তধারা (ঢাকা, ১৯৮৭), পৃ. ২০

২. আবুল মনসুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩. মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরীর বিশ্ববীক্ষণ, দেশপ্রসঙ্গ, সম্পাদক : ইমদাদুল হক সুফী (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ১১

৪. মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, Art of Bangladesh Series-6, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (ঢাকা, ২০০৩), পৃ. ২৭

৫. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী (শিল্পীর একান্ত জীবন কথা), প্রথমা প্রকাশন (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৮৩-৮৪

৬. মইনুদ্দীন খালেদ, বাংলাদেশের চিত্রশিল্প, দিব্য প্রকাশ (ঢাকা, ২০০০), পৃ. ৮৩

৭. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, শিল্পীর চোখ, তরফদার প্রকাশনী, (ঢাকা, ২০০৭) পৃ. ৪৩

৮. সৈয়দ আলী আহসান, শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (ঢাকা, ২০০৪), পৃ. ৪৮

৯. আবুল মনসুর, ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে সাম্প্রতিককাল, চারু ও কারুকলা, সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ৩৮

১০. বাংলার লোকশিল্প আমাকে শিল্পী বানিয়েছে–কাইয়ুম চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাহবুব রেজা, শিল্পপ্রভা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (ঢাকা, ২০১৪), প্রকাশক, অঞ্জন চৌধুরী, সম্পাদক : রফি হক, পৃ. ১৫-১৬

১১. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী (শিল্পীর একান্ত জীবন কথা), প্রথমা প্রকাশন (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৫৭, ৫৮, ৫৯

১২. মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫

১৩. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী নান্দনিকতা, দেশপ্রসঙ্গ, সম্পাদক: ইমদাদুল হক সুফী (ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৮

১৪. সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, কাইয়ুম চিত্রকথা, দেশপ্রসঙ্গ, সম্পাদক : ইমদাদুল হক সুফী (ঢাকা, ২০১৫), পৃ.২৯

১৫. সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, চারু ও কারুকলা, সম্পাদক : লালা রুখ সেলিম, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৩৮২-৩৮৩

১৬. মফিদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

চিত্র : ১, ২, ৩, ৪

সৌজন্যে :

মফিদুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী, Art of Bangladesh Series-6, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, (ঢাকা, ২০০৩)

সৈয়দ আজিজুল হক, কাইয়ুম চৌধুরী (শিল্পীর একান্ত জীবন কথা), প্রথমা প্রকাশন (ঢাকা, ২০১৫)

শিল্পপ্রভা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (ঢাকা, ২০১৪)